নারী-পুরুষ ব্যবধানের বিশ্বচিত্রে বাংলাদেশ

চিররঞ্জন সরকার

১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেয়ার পর নারী পরিচালিত সমিতির এক সভায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'কোনো জাতি কতটা উন্নত হয়েছে তা বুঝতে হলে দেখতে হবে সেই জাতি নারীদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করছে।' তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেছিলেন, 'একটি পাখির দুটি ডানা থাকে, একটি বিকল হলে সে আর আকাশে উড়তে পারে না।'

এর কিছুকাল পরে ভারতবর্ষে নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন লিখেছিলেন, 'পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে— একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা— উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে— সর্ব্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন— আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন!' [স্ত্রীজাতির অবনতি, মতিচূর, প্রথম খণ্ড (রোকেয়া-রচনাবলী, পৃষ্ঠা ২২)।

বিবেকানন্দ এবং বেগম রোকেয়া উভয়েই নারী-পুরুষের সম্মিলনে সমাজের শক্তি ও উন্নতিকে কল্পনা করেছিলেন। তাঁরা নারী-পুরুষকে দেখেছিলেন পাখির দুইটি ডানার মতো, সাইকেলের দুইটি চাকার মতো। এর একটিকে দুর্বল করে রাখলে সমাজেরও অগ্রগতি হতে পারে না। নারীদের সম্পর্কে স্বামীজী ও বেগম রোকেয়ার ওই তাৎপর্যমণ্ডিত অভিমত প্রতিবিম্বিত হয়েছে 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম' প্রকাশিত ২০১৪ সালের 'বিশ্ব নারী-পুরুষ ব্যবধানের প্রতিবেদন' (The Global Gender Gap Report 2014)-এর প্রথম কয়েকটি বাক্যেই। সেখানে বলা হয়েছে, স্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক

বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষ এবং তার মেধাই দুটি মৌলিক পরিচালক। এই মেধার অর্ধেক যদি অনুন্নত অথবা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে, তাহলে অর্থনৈতিক প্রগতি যা হতে পারত, তা হবে না (People and their talents are two of the core drivers of sustainable, long term economic growth. If half of these talents are underdeveloped or under utilized, the economy will never grow as it could)। তার পরেই বলা হয়েছে— বহু গবেষণালব্ধ তথ্যে দেখা গেছে, দেশে নারীসমাজের প্রতি বৈষম্য দূর করে যদি দেশ উন্নয়নের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নারীসমাজের অভিমতকে অধিক গুরুত্ব দেয়, তা হলে গোটা সমাজের অধিকাংশের উন্নয়ন ও প্রগতি সাধিত হবে। এই আন্তর্জাতিক সংস্থা অনেক বছর ধরে বিশ্বের দেশে দেশে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য সম্পর্কে গবেষণা করে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করার জন্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে চলেছে। ওই প্রতিবেদনে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে নারী এবং পুরুষের মধ্যে ব্যবধান চিহ্নিত করা হয়েছে চারটি ক্ষেত্রে; যেমন, ১. আর্থিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং উভয়ের সুযোগ, ২. শিক্ষায় উভয়ের স্থান। ৩. স্বাস্থ্য এবং বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে উভয়ের ব্যবধান এবং (৪) রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে উভয়ের অবস্থান। আর ওই চারটি ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অবস্থা একত্রিত করে নারী-পুরুষের ব্যবধানের গড় হিসেব করে বিশ্বের দেশগুলির সূচক তৈরি করে। ওই বিশ্বসূচকে ২০১৪ সালে বিশ্বের ১৪২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান হয়েছে ৬৮তম স্থানে, ভারতের স্থান হয়েছে ১১৪তম স্থানে। ২০১৩ সালে ১৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৫।

বিশ্বের ১২৩টি দেশে জনসংখ্যার দিক থেকে নারী পুরুষের প্রায় সমান। বিশ্বের মোট জনসংখ্যায় নারী ৪৯.৭ শতাংশ— এটা জাতিসংঘ প্রকাশিত তথ্য (দ্য ওয়ার্ল্ড উইমেন প্রগ্রেস ইন স্ট্যাটিসটিক্স)। অথচ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীসমাজ বৈষম্যের শিকার— এই আত্মহননের কাহিনিই ২০১৪ সালের আলোচ্য প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। নারীর ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বে বহু আলোচনা এবং আন্দোলন হয়েছে। সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে চিনের রাজধানী পিকিং তথা বেইজিং শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব নারী সম্মেলন। ঘোষিত হয়েছিল অনেক কর্মসূচি। কিন্তু এখনো সেই ব্যবধানের বেদনা-বিধুর, নির্মম-নিষ্ঠুর চিত্র এই প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আত্মপ্রত্যয় নিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন যে বাণী—

বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি।

আমাদের সমাজে বর্তমানে ধর্মবিশ্বাসের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত। রাজনীতিবিদরা পর্যন্ত ধর্মমতকে সমীহ করে পথ চলেন। অনেক সময় বিভিন্ন উগ্রধর্মবাদীদের সঙ্গে আপোস-আঁতাতও করেন। এমনকি ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার পর্যন্ত করেন। কিন্তু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে যে সকল আপত্তিকর, জনবিরোধী, মানবতাবিরোধী কথা আছে, তার বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। ধর্মমতকে এতটাই সবাই সমীহ করেন যে, কেউ আর সাহস করে বলতে পারেন না যে বর্তমান যুগে ওই শাস্ত্রীয় বচন আর অনুকরণযোগ্য নয়।

পুরুষদের স্বার্থে পরিচালিত বিধি-বিধান, ধর্মীয় আচার আর আইন নারীদের সব সময় প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয়। সমাজে নারীরা কখনো আপন ভাগ্য জয় করবার সুযোগ তেমনভাবে পায় না। মনু-সংহিতার তৃতীয় শ্লোকে উল্লেখ আছে, ‘পিতা রক্ষতি কৌমরে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে, রক্ষন্তি স্তবিরে পুত্র, ন স্ত্রী

স্বাতন্ত্র্য মর্হতি' (শৈশবে রক্ষাকর্তা পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্র— স্ত্রী জাতির কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই)। এভাবেই নারীরা পরনির্ভরশীলতার চক্রে ঘুরপাক খায়। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য অনেক মুক্তমনা পুরুষ ও নারী যুগে যুগে সংগ্রাম করেছেন, উদ্যোগ নিয়েছেন। আমাদের এই উপমহাদেশে নারীজাগরণের পক্ষে অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তি সোচ্চার ভূমিকা পালন করে চলেছেন। মানবদরদী লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যেও নারীসমাজের অধিকারের জন্য কলম ধরেছিলেন। ১৮৫৯ সালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী' উপন্যাসে স্ত্রী-স্বাধীনতার যৌক্তিকতার কথা লিখেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে ১৮৬২ সালে নারীর শৌর্য, বীর্যের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছিলেন। 'বামাবোধিনী' পত্রিকা ১৮৬৩ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নারীমুক্তির জন্য দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছিল দীর্ঘকাল ধরে। ১৯৩৮ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে নারীর মহিমা, নারীর উজ্জ্বল, হৃদয়স্পর্শী ভূমিকা অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের আপোসহীন সংগ্রামের ফলে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর 'সতীদাহ' প্রথার মতো নিষ্ঠুর, হিংস্র, মানবতাবিরোধী প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য শত বাধা-বিপত্তিকে লঙ্ঘন করে যে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা অনন্য। বেগম রোকেয়া, ইলা মিত্র, বেগম সুফিয়া কামাল, নূরজাহান বেগম, হেনা দাস প্রমুখরা নারীসমাজের যোগ্য ভূমিকা পালন করার সুযোগ সৃষ্টির উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। নারীর অধিকারের পক্ষে আমাদের দেশেও প্রকাশিত হয়েছে অনেক মূল্যবান সাহিত্য। কিন্তু তারপরও আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান এখনও হতাশাব্যঞ্জক।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) 'দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ' রিপোর্ট ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন মতে, জেন্ডারবৈষম্য দূরীকরণে এগিয়েছে বাংলাদেশ। প্রতিবেদনে বলা হয়, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সুযোগ, শিক্ষায় অর্জন এবং স্বাস্থ্যখাতেও উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৭তম, শিক্ষায় ১১১তম। বলা হয়, জেন্ডারবৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম এগিয়ে যাওয়া দেশ। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি সেকেন্ডারি শিক্ষায়ও নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১২২তম। তবে বাংলাদেশে সবচেয়ে ভালো সাফল্য দেখা যায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে। এতে বাংলাদেশের অবস্থান ১০তম। বলা হয়, গত ২১ বছর ধরেই বাংলাদেশে নেতৃত্ব দিচ্ছে নারী। তবে নারীদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিকানা বা কোনো প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্তা হওয়ার দিক থেকে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে।

বৈশ্বিক এ তালিকায় শীর্ষ পাঁচে রয়েছে আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্ক। এতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ২০তম স্থানে। একথা সুবিদিত যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনেই জেন্ডার সমতা অর্জন করা জরুরি। সেসব দেশই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারবে, যেসব দেশে নারী-পুরুষ মিলিয়ে সব মেধাবীরাই অর্থনীতিতে অবদান রাখার সমান সুযোগ পাবে। এ পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমাদের দেশে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে দেখা দরকার।

নারী উন্নয়ন, এমডিজি এবং উন্নয়ন অ্যাজেন্ডা

সারা বিশ্বের দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন মানুষদের অগ্রাধিকার দেয়া ও তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বৈশ্বিকভাবে ২০০০ সালে যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি প্রণয়ন করা হয়েছিল, জাতিসংঘের মিলিনিয়াম সামিটে, তখন ১৮৯টি দেশ (পরে ১৯৩টি) এবং কমপক্ষে ২৩টি আন্তর্জাতিক সংগঠন এই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় মূলত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো এবং মানবাধিকারসহ (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ওপর। মানবসম্পদ উন্নয়ন বিশেষ করে পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। অবকাঠামো বলতে বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নসহ পরিবহন ও পরিবেশের উন্নয়নকে বোঝানো হয়েছিল। মানবাধিকার উন্নয়নের উদ্দেশ্য ছিল মূলত নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে আনা, মতামত প্রদানে স্বাধীনতা, সরকারি চাকুরিতে সমান অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের জন্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জীবনের উন্নতিসাধন।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার উন্নয়ন

বাংলাদেশে নারীমুক্তির ইতিহাস দীর্ঘদিনের, স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। সুদৃঢ় প্রশাসনিক ও আইনি কাঠামো, সচেতন সুশীল সমাজের কারণে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে, যা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ শুরু থেকেই কয়েকটি ধারায় সংরক্ষণ রেখে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদে (সিডও) স্বাক্ষর করেছে।

সব ধরনের শিক্ষায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করা ছিল এমডিজির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য অনেকটাই কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন জেন্ডার সমতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্যসমূহ জেন্ডার সমতা তৈরি, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় নি যতটা দেয়া হয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে (লক্ষ্য ২) বাংলাদেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিট ভর্তির হার ৯৮.৭ (বালক ৯৯.৪ ও বালিকা ৯৭.২)। শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগতমান অর্জনের জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন, এর মধ্যে নবম শ্রেণি পর্যন্ত যথাসময়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ, প্রাথমিক স্কুল সমাপ্তি পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সমাপ্তি প্রবর্তন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জনে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে ও সেবা খাতে নারীর অংশগ্রহণমূলক অগ্রগতি সাধনের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রবর্তন করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়, যেমন ইউনিয়ন এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের হার ১৯.৮৭ শতাংশ।

বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক। অকৃষিখাতে নারীর কর্মসংস্থান বর্তমানে শতকরা ২৫ ভাগ। মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখে ১৯৪ জন। বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয়ভাবে সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার হার বাড়ানো এবং বিশেষ করে মেয়েশিশুদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়েশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, যা শিক্ষায় জেন্ডার সমতা তৈরির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অর্জন এনে দিয়েছে। এই শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম বিশ্বে একটি উৎকৃষ্ট অনুশীলন (বেস্ট প্র্যাকটিস) হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, গত কয়েক দশকে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন কার্যক্রম; যেমন বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, যেসব মায়েরা শিশুসন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান তাদের জন্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা প্রদান করেছে, যা অতিদরিদ্র নারীদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা তৈরিতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করলেও নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস-২০১১) তথ্য মতে, আমাদের দেশে ৮৭ ভাগ নারী স্বামীর ঘরে এবং ১৬ ভাগ নারী কর্মস্থলে নির্যাতনে শিকার হন। বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু সার্বিক বিষয়ে অগ্রগতি মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে একথা সত্য এবং ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কাঠামোতে নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার বিষয়টি কীভাবে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়টি এখনই ভাবতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় নারীর ক্ষমতায়নের কোন বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, সেগুলো নিয়ে আলোচনা এখনই শুরু করতে হবে। উল্লেখ্য, ৬ষ্ঠ পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিণত করার জন্য এদেশের নারীসমাজকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের আরেকটি বড়ো অর্জন হলো স্থানীয় সরকার আইন। এই আইনের ফলে নারীদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করার অধিকার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নির্বাচিত নারীদের এলাকায় সম্মান ও ক্ষমতা দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করার ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতির পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করেছে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ফলে তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা তাদের সমস্যাগুলো সহজেই স্থানীয়ভাবে তুলে ধরতে পারছে।

এমডিজির পরবর্তী অবস্থা ও নারী উন্নয়নে যা প্রয়োজন

পৃথিবীর নানা দেশে এমডিজির লক্ষ্য ও টার্গেটসমূহ কম-বেশি নানা মাত্রায় সফল হলেও বাস্তবতা হচ্ছে, একশ কোটিরও বেশি মানুষ এখনো চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, তার চেয়েও ঢের বেশি মানুষ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে চরমভাবে বঞ্চিত এবং চরম বৈষম্য রয়েছে আয়ের ক্ষেত্রে, লিঙ্গ-বর্ণ-প্রতিবন্ধিতা-বয়স আর অবস্থানের ক্ষেত্রে তো বটেই। এটা জানা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন নীতিটা কাজ করছে আর কোনটা কোনো কাজেই আসছে না।

ইতোমধ্যে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কাঠামো কী হবে এ নিয়ে জাতিসংঘ সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা করছে। এ ছাড়া,

২০১৫ সাল পরবর্তী উন্নয়ন কাঠামো যাতে একটি দরিদ্রবান্ধব পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন কাঠামো হিসেবে রূপ পায় এবং জনঅধিকারসমূহ প্রতিফলিত হয় সে উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়ন সংগঠন গবেষণা, প্রচারণা ও নীতিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে আসছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অধিকার আদায়ের জন্য দেশে সুশাসন ও অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

দরিদ্র নারীদের উন্নয়নে প্রচলিত বৈশ্বিক উন্নয়ন মডেলের ভূমিকা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়ন কাঠামো ও পরিকল্পনায় নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ন্যায্যতা, সর্বোপরি মানবাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সারা বিশ্ব আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যেকোনো সময়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের অবস্থা দেশে দেশে ক্ষমতা ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা তৈরির পাশাপাশি নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। নারীর জন্য প্রয়োজন একটি নতুন উন্নয়ন মডেল, যার লক্ষ্য হবে দেশে দেশে ধনী ও গরিব, নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পদ ও ক্ষমতার বৈষম্য হ্রাস করা। উন্নয়নের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত সকল জনগোষ্ঠীর জীবনজীবিকা ও সকলের জন্য টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা।

নারীদের জন্য যে নতুন উন্নয়ন মডেলের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা চলছে, সেখানে মূলত মোটা দাগে ৪টি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

১. ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নারীর মালিকানা স্থাপন : দেখা যাচ্ছে যে, ভূমির ওপর নারীদের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলে পরিবার ও জনগোষ্ঠীর খাদ্য সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ ও টেকসই কৃষিব্যবস্থার নিশ্চয়তা তৈরি হয়। অনেক দেশেই ভূমির ওপর নারীর অধিকার আইন, পারিবারিক আইন ও বৈবাহিক সূত্র দ্বারা সীমিত করা হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভূমি কেবল আয়ের উৎস নয়, এটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকারের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। ২০১৫ পরবর্তী পরিকল্পনায় ভূমির ওপর নারীর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পানি, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদির ওপর তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও সেই মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। ভূমিদস্যু, বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূমি মালিকদের দ্বারা ভূমি দখলের মাত্রা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে, এর ফলে গ্রামে বসবাসরত পরিবারের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের সংখ্যাও বাড়ছে। কী পরিমাণ জমি নারী, ক্ষুদ্র কৃষকদের মালিকানায় রয়েছে, সেই সঙ্গে কী পরিমাণে থাকা উচিত ছিল এ বিষয়ে পরিষ্কার তথ্য থাকা দরকার।
২. মানসম্মত কাজের পরিবেশ ও মজুরি : নতুন উন্নয়ন মডেলের বিষয়ে ভাবতে হলে প্রথমেই আমাদের শ্রমিকের ন্যায্য মজুরির বিষয়টি আলোচনায় আনতে হবে, বিশেষ করে নারীশ্রমিকের মজুরির বিষয়টি। মানসম্মত কাজের পরিবেশ ও ন্যায্য মজুরি ব্যতীত দরিদ্র্য বিমোচন কখনই সম্ভব নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের শ্রমিকের অধিকাংশই নারী শ্রমিক, যারা গার্মেন্টস, কৃষি, ঘর-গৃহস্থালিসহ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং তারা খুবই শোচনীয় একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে কাজ করছেন। এ অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যচ্ছে। প্রবৃদ্ধি নির্ভর উন্নয়ন, মুনাফা ও পুঁজিকেন্দ্রিক ব্যবসা এবং উৎপাদন চাহিদা বৃদ্ধি ও সস্তা শ্রম ও উৎপাদন মূল্য ইত্যাদি সকল বিষয়ই নারী শ্রমিকের ওপর এক ধরনের বোঝা তৈরি করছে। প্রতিদিন উৎপাদন টার্গেট বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পায় না। দারিদ্র্য ও ঋণের কারণে তারা নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাজ করছে ফলে তাদের নিজস্ব স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং পরিবারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উপেক্ষিত হচ্ছে। আমাদের এমন একটি উন্নয়ন কৌশল দরকার, যেখানে শ্রমিক, তার পরিবার ও ওই জনগোষ্ঠীর

নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি মানসম্মত মজুরি নির্ধারণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে একজন শ্রমিক সম্মানের সঙ্গে তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন।

৩. শান্তি ও ন্যায় বিচার বা নায্যতা : একটি ন্যায্য ও টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে নারীর নিরাপত্তা ও অধিকারে প্রশ্নে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া, সুশাসনের শূন্যতা নারী অধিকার নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অধিকন্তু, নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়টি উন্নয়ন কাঠামোর মধ্যে রাখা হয় নি। নারীর প্রতি সহিংসতা সুস্পষ্টভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন, যাকে অন্যান্য উন্নয়ন অধিকারের অন্তরায় মনে করা হয়। সহিংসতার ফলে নারী ও শিশু গৃহহীন, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, নিরাপত্তাহীনতাসহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।

৪. নারীদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ : সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, এটা শুরু করতে হবে ঘর থেকে এবং সরকারি উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। বহুজাতিক কোম্পানিতে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে শ্রম ও পরিবেশ বিষয়ে কোম্পানিগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মানের কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, নারীদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণকে নারী অধিকার, জেন্ডার সমতা, টেকসই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত বলে মনে করা হয়। এ ছাড়া, সরাসরি রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নারীদের ক্ষমতায়নকে আরো জোরদার করে। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে নারী আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।

জেন্ডার সমতা একটি মৌলিক অধিকার। জেন্ডার সমতা তৈরি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য বাস্তব এবং কার্যকরী পদক্ষেপ। দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার পাশাপাশি একটি একীভূত সমাজ বিনির্মাণে টেকসই উন্নয়ন খুবই জরুরি। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ও নির্মূলকরণে একটি পূর্ণাঙ্গ শক্তিশালী জাতীয় পরিকল্পনা প্রয়োজন। সিদ্ধান্তগ্রহণের সকল পর্যায়ে শতকরা ৫০ ভাগ নারীর অংশগ্রহণের টার্গেট থাকতে হবে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে বহু অংশীদারিত্বমূলক অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেখানে ৫০ ভাগ নারী ও কমপক্ষে ২০ ভাগ নারী আন্দোলনের কর্মীর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা যায়। নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সুরক্ষা, জেন্ডার সমতা ও এর অগ্রাধিকার থাকতে হবে এবং জেন্ডার ন্যায় প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট কাঠামোগত পদক্ষেপকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্বীকৃত হতে হবে।

এখনো বাকি অনেক পথ

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) কর্তৃক প্রকাশিত জেন্ডার ব্যবধান সূচকে (গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স বা ট্রিপল জিআই) ২০১৪ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের যে সাফল্য উল্লেখ করা হয়েছে সেটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। ওই সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, জেন্ডার সমতা রক্ষায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। মনে রাখা দরকার যে, ওই প্রতিবেদনে উল্লিখিত সূচকটি জেন্ডার সমতা আনয়নে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের সাফল্য যেভাবে বলা হয়, নারীর ক্ষমতায়নের প্রকৃত চিত্র সেভাবে তুলে ধরে না। তবে বাংলাদেশে জেন্ডার সমতা আনয়নে যে মাত্রায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার সাফল্যের হার বেশি। তাই জেন্ডার সমতা আনয়নের দীর্ঘ পথে পরিসংখ্যানটিকে আমাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে নেয়া উচিত।

তবে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণ আরো বাড়াতে হবে। নইলে ব্যাহত হবে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন। সে জন্য সার্বিকভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা বাড়াতে হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নে কার্যকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

নারীর কর্মমুখী জীবনে সবচেয়ে বড়ো বাধা হলো যৌন হয়রানি ও নির্যাতন। নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখা গেলেও নারী নির্যাতনের হার আমাদের সমাজে এখনো কমে নি। বরং নির্যাতনের ভয়াবহতা যেন বেড়েই চলেছে।

পুরুষশাসিত সমাজও এই অবস্থার জন্য অনেকটা দায়ী। এটা দুর্ভাগ্যের যে, আমাদের দেশে ছেলে আর মেয়েকে একইভাবে বড়ো করা হয় না। কাজ, শিক্ষা, খাদ্য কোনো ক্ষেত্রেই সমান চোখে দেখা হয় না। অবাধে ঘটে নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি। এমনকি ধর্ষণ। এই নির্যাতনকারী ও ধর্ষণকারীরা আমাদের এই সমাজেই জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে। তাদের মনস্তত্ত্বে ঢুকিয়ে দেয়া হয় শ্রেষ্ঠত্বের বোধ, পুরুষ হয়ে জন্মানোর অহং। যার বীজ শুধু ধর্ষণকারীর ভেতরেই নয়, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যেও রয়েছে। শহর, গ্রাম সর্বত্র পুলিশসহ আইন ও বিচারব্যবস্থার অধিকাংশই আসছে এই মানসিকতা নিয়ে। পুলিশ নিজেই ধর্ষণ করছে এমন অভিযোগও তো কম নয়। আবার যিনি ধর্ষিতা হচ্ছেন সেই নারীর 'নৈতিকতা' (অর্থাৎ তিনি কুমারী কি না, তাঁর পোশাক কীরকম, পেশা কী, কেন রাত করে বাড়ি ফেরেন) নিয়েও চুলচেরা আলোচনা আর বিচার শুরু হয়। ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যেন, যে ধর্ষণ করেছে, সে নিগৃহীতার তুলনায় অনেক বড়ো মাপের মানুষ!

এই সামাজিক অসুখ থেকে উদ্ধারের কোনো শর্টকাট পদ্ধতি আছে বলে মনে হয় না। এ জন্য চাই দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা। যার মধ্যে রয়েছে পুরুষ ও নারীকে সমান চোখে দেখার চেষ্টা শুরু করা, নীতিনির্ধারক, প্রশাসক, পুলিশের মানসিকতার বদল, বিচারব্যবস্থার সংস্কার। আপাতত যেটা করা যায় তা হলো, নারীদের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য আইন আরো মজবুত করা, আদালতে দোষী সাব্যস্ত করার হার বাড়ানো। রোগ সারানোর জন্য স্বল্পমেয়াদি কিছু ব্যবস্থার পাশাপাশি দরকার দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা আর মানসিকতার আমূল পরিবর্তন।

চিররঞ্জন সরকার সিনিয়র কমিউনিকেশন অফিসার, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি, ব্র্যাক। chiroranjan@gmail.com